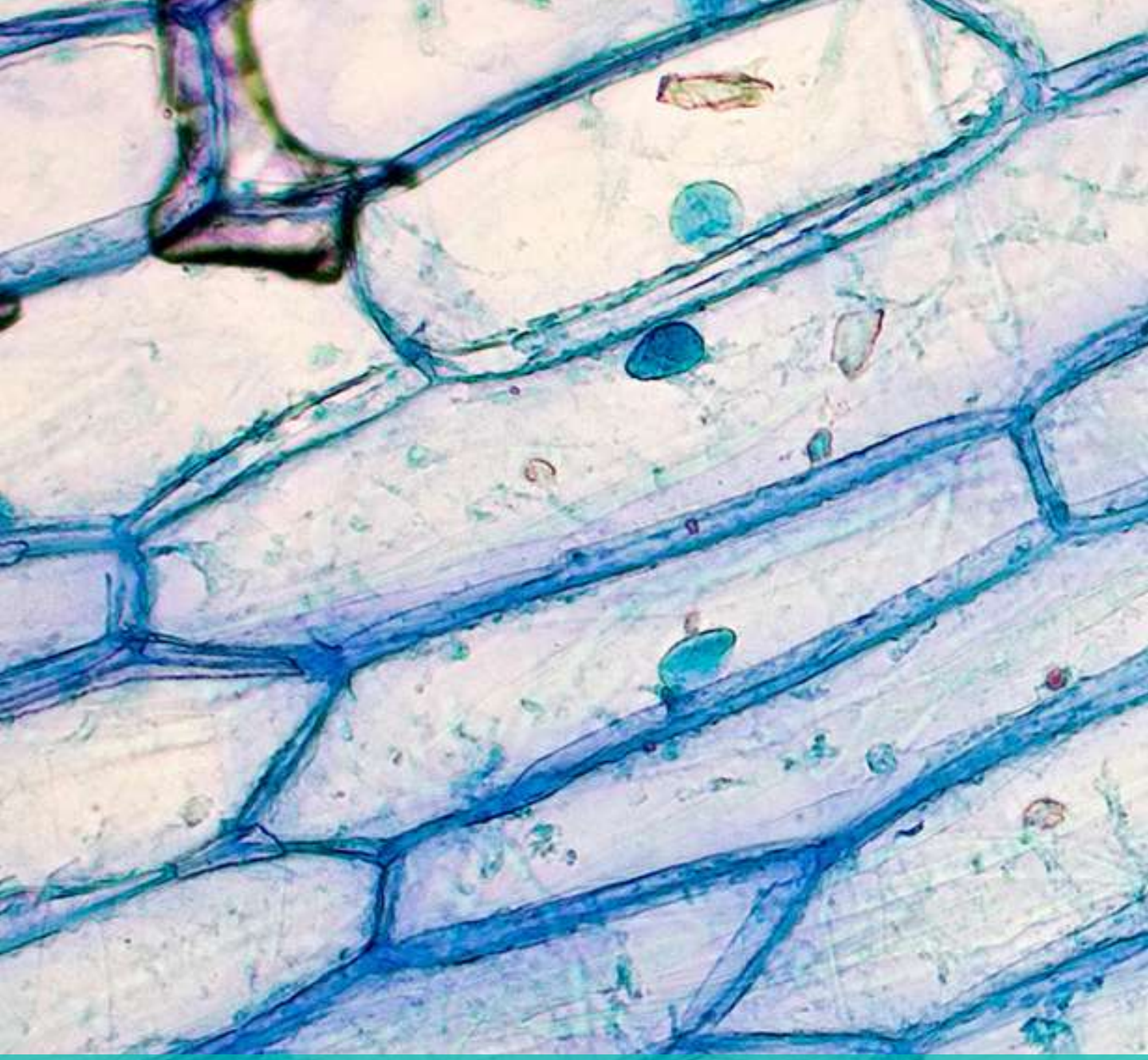

অধ্যায় ৪

কোষবিজ্ঞান

অধ্যায় ৪ কোষবিজ্ঞান

এই অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিখতে পারবে—

- ☑ উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের প্রধান অঙ্গাণুগুলোর গঠন এবং কাজ
- ☑ কোষের বিভাজন ও সংখ্যা বৃদ্ধি
- ☑ অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের পরিণতি

স্কুল ঘরের বাইরে তাকালেই তুমি দেখবে, আমাদের চারপাশে কত রকম জীবনের সমাহার! ছোট-বড় গাছ, নানান রঙের পাখি, পোষা প্রাণী আর মানুষ তো আছেই। এসব জীব আমাদের চোখের সামনেই ছোট থেকে বড় হয়। একটি জড় পদার্থ (যেমন, বই, কলম বা ঘর) নিজে নিজে বড় হয় না। অথচ একটা জীব কিন্তু সময়ের সঙ্গে একটু একটু করে বড় হয়। কীভাবে ঘটে এই ব্যাপারটি? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের ফিরতে হবে ছোট থেকে আরো ছোট পর্যায়ে। জানতে হবে জীবনের গাঠনিক এককের পরিচয়।

তোমরা এর মধ্যে নিশ্চয়ই জেনে গেছ, যে জীবের গাঠনিক একক হচ্ছে কোষ। আমরা ছোট বড় যত জীব দেখি, সেগুলোর সবগুলোরই গঠনের একক হিসেবে আছে কোষ। জীবের বড় হবার প্রক্রিয়ায় সেগুলোর নতুন নতুন কোষ তৈরির প্রয়োজন হয়। এসব নতুন নতুন কোষ কীভাবে তৈরি হয়? কীভাবে জীবের বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়? এমন প্রশ্ন আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নগুলো নিয়ে ভেবেছেন এবং আনন্দের বিষয় হচ্ছে, তারা গবেষণা করে এগুলোর উত্তরও বের করেছেন। আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করব এখানে। জানব জীবকোষের পরিচয়, সেগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতি, কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় যদি কোনো ভুল হয়, তবে তা জীবের জন্য কী পরিণতি ডেকে আনে ইত্যাদি। তবে তার আগে আমাদের কোষের গঠন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জেনে নিতে হবে।

কোষ পরিচিতি

সকল জীবই কোষ নিয়ে গঠিত। বাংলা কোষ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Cell, যার আক্ষরিক অর্থ ছোট ঘর বা প্রকোষ্ঠ। Cell নামকরণটি করেছেন বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke), যিনি অণুবীক্ষণযন্ত্রের (Microscope) আবিষ্কারক। তিনি অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের পর একটি বোতলের কর্ক (Cork কাঠ থেকে তৈরি করা একধরনের ছিপি যা বোতলে মুখ বন্ধ করতে ব্যবহার করা হয়) পর্যবেক্ষণ করছিলেন। খালি চোখে যা দেখা যায় না, তাই তিনি দেখলেন অণুবীক্ষণযন্ত্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে। কর্কের কাঠের কোষগুলো

একের পর এক ছোট ছোট ঘরের মতো করে সাজানো দেখাচ্ছিল বলেই রবার্ট হুক এগুলোর নাম দিলেন সেল (Cell)।

আমরা ইটের পর ইটের গাঁথুনিতে যেমন একটি বড় বাড়ি তৈরি হতে দেখি, তেমনি কোষের পর কোষ

রবার্ট হুক অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহার করে উদ্ভিদ কোষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন

যুক্ত হয়ে একটি বহুকোষী জীবদেহ তৈরি হয়। বহুকোষী জীবদেহে কোটি কোটি কোষ থাকতে পারে। তবে বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থান ও জীবদেহের বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে কোষগুলোর মধ্যে আকৃতি ও কাজের ভিন্নতা থাকে। যেমন, মানব শরীরের মস্তিষ্ক ও কিডনির কোষগুলো দেখতে ভিন্ন ভিন্ন, সেগুলোর কাজও আলাদা। কিন্তু সেগুলোর গঠন উপাদান অনেকটা একইরকম। এসব উপাদান নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

কোষকে বলা হয় জীবের গঠন এবং কাজ সম্পাদনের একক (Structural and functional unit)। অর্থাৎ একটি জীবের শারীরিক গঠনের একক হচ্ছে কোষ, আবার তার যেকোনো কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্রাথমিক জায়গাটাও হচ্ছে কোষ। কিছু কিছু জীব আছে যেগুলো এককোষী, যেমন- ব্যাকটেরিয়া (Bacteria), অ্যামিবা (Amoeba), ইস্ট (Yeast) ইত্যাদি। এককোষী জীব এতই ক্ষুদ্র যে, সাধারণত অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এগুলোকে দেখা যায় না। আমরা আমাদের খালি চোখে যত জীব দেখি, সেগুলো সবাই বহুকোষী। যেমন- গাছপালা, মানুষ, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি বহুকোষী জীব। এসব জীব তৈরি হয় অনেক অনেক কোষ মিলে।

বিভিন্ন জীব দেখতে আলাদা হলেও সেগুলোর গঠন ও কাজ সম্পন্নকারী কোষগুলোর মৌলিক উপাদান একইরকম। সকল জীবের কোষই শর্করা বা কার্বহাইড্রেট (Carbohydrate), লিপিড (Lipid), প্রোটিন (Protein) নামের জৈব অণু দিয়ে তৈরি হয়।

শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হলো এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ যার প্রতিটি অণুতে কার্বনের (C) সঙ্গে হাইড্রোজেন (H) এবং অক্সিজেন (O) থাকে, যেখানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত হয় ঠিক পানির মতো ২:১। জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।

লিপিড জীবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম, যা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত। লিপিডের প্রধান কাজ হচ্ছে শক্তি সঞ্চয় করে রাখা, কোষ পর্দার গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করা ইত্যাদি।

প্রোটিন হলো এক প্রকারের বৃহৎ আকারের জৈব অণু, যা একাধিক অ্যামিনো অ্যাসিডের (এক ধরনের জৈব অণু) মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ বা বন্ধনের মাধ্যমে তৈরি হয়। বিভিন্ন প্রোটিন জীবদেহের ভেতরে নানা কাজ সম্পাদন ও নিয়ন্ত্রণ করে।

উপাদানের দিক থেকে একই হলেও ভিন্ন জীবের কোষগুলোর ভেতরে গঠনগত পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন- উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের ভেতর গঠনগত কিছু পার্থক্য আছে। এমনকি মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের কোষগুলোও গঠন ও কাজের দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। একটি কোষ যেসব ছোট ছোট অংশ নিয়ে গঠিত হয়, সেগুলোকে কোষের অঙ্গাণু (Organelle) বলা হয়। নিচে আমরা উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর কাজ সম্বন্ধে জানব।

উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষের প্রধান অঙ্গাণুগুলোর গঠন এবং কাজ

আকার এবং আয়তনের দিক থেকে কোষ অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও এগুলোর গঠন উপাদান বেশ বৈচিত্র্যময়। আর কোষের এসব গঠন উপাদানের কাজের পরিধিও বিস্তৃত। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় এমন কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোষীয় অংশ হলো- (ক) কোষ প্রাচীর, (খ) কোষ ঝিল্লি এবং (গ) প্রোটোপ্লাজম। সংক্ষেপে এগুলোর গঠন এবং কাজ বর্ণনা করা হলো-

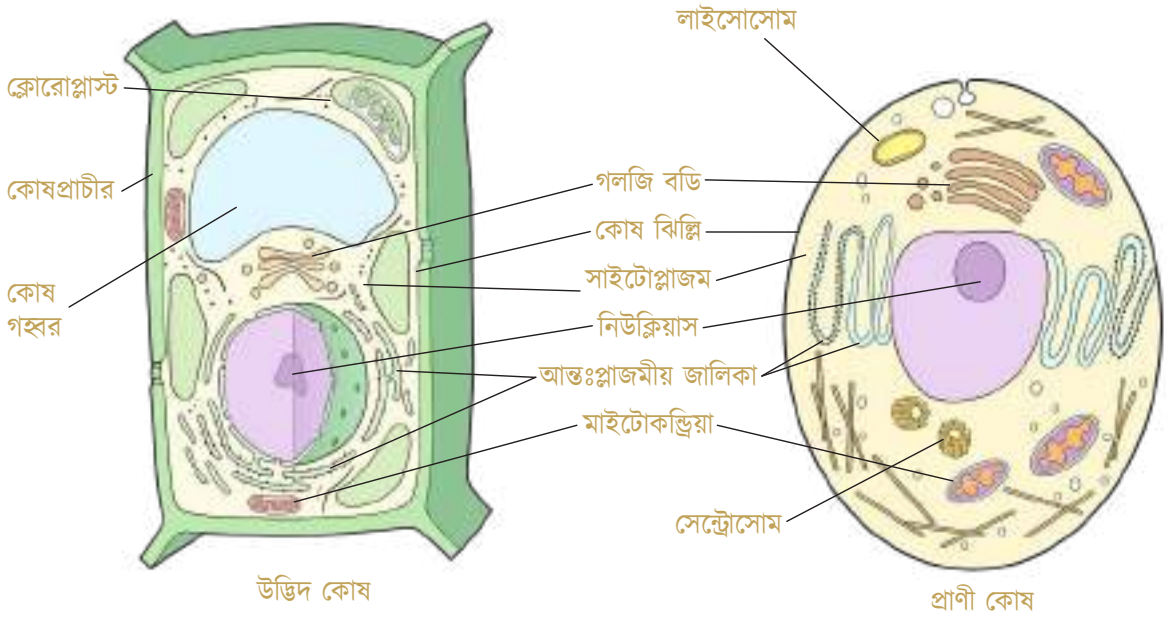

(ক) কোষপ্রাচীর (Cell wall): উদ্ভিদ এবং কিছু অণুজীব কোষের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কোষপ্রাচীর। কোষের একেবারে বাইরের দিকে শক্ত আবরণকে বলা হয় কোষপ্রাচীর। প্রাণী কোষে কোষপ্রাচীর থাকে না। উদ্ভিদ কোষের কোষপ্রাচীরের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো- সেলুলোজ (Cellulose) নামে কার্বোহাইড্রেট। একই সঙ্গে লিগনিন (Lignin) নামে এক ধরনের জৈব পদার্থ (যা বেশির ভাগ উদ্ভিদের মূল কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করে) উদ্ভিদের কোষপ্রাচীরে পাওয়া যায়।

অপরদিকে ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরের মূল উপাদান হচ্ছে কিছু প্রোটিন ও লিপিড। ছত্রাকের কোষপ্রাচীরে কাইটিন (Chitin) জাতীয় এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট থাকে। সুতরাং, অনেক জীবে কোষপ্রাচীর থাকলেও, সেগুলোর গঠন উপাদানে কিছুটা পার্থক্য থাকে।

কোষপ্রাচীর কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, বাইরের প্রতিকূল অবস্থা থেকে ভেতরের বস্তুকে রক্ষা করে, কোষকে প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা প্রদান করে, পানি ও খনিজ লবণ শোষণ-পরিবহনে সহায়তা করে এবং পাশাপাশি কোষগুলোর স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে রাখে।

(খ) কোষ ঝিল্লি (Cell/plasma membrane): কোষ ঝিল্লি কোষকে নিরাপদ রাখার কাজটি করে। তাই এটি হচ্ছে কোষকে ঘিরে থাকা দুটো স্তরবিশিষ্ট একটি নমনীয় (Flexible) আবরণ বা পর্দা (ঝিল্লি) যা বাইরের পরিবেশ থেকে কোষের ভিতরের উপাদানগুলোকে আলাদা রাখে। এটি মূলত লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত। প্রাণীকোষে যেহেতু কোষপ্রাচীর থাকে না, তাই কোষঝিল্লিই হচ্ছে প্রাণীকোষের সবচেয়ে বাইরের স্তর। অপরদিকে যেসব কোষে কোষপ্রাচীর থাকে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এই ঝিল্লি বা পর্দা কোষপ্রাচীরের ঠিক নিচেই অবস্থান করে। কোষ ঝিল্লির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এগুলো ভেদ করে সব উপাদান কোষের ভেতর থেকে বাইরে যেতে পারে না, বা বাইরে থেকে ভেতরে আসতে পারে না। বরং কেবল নির্দিষ্ট কিছু উপাদান এই পর্দা ভেদ করে কোষের বাইরে থেকে কোষের ভেতরে যাতায়াত করতে পারে।

(গ) প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm): কোষ প্রাচীর এবং ঝিল্লি দ্বারা ঘিরে থাকা কোষের যে স্বচ্ছ, ঘন ও জেলির মতো বস্তু দেখা যায়, তাকে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম। প্রোটোপ্লাজমে শতকরা ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ পানি। কোষের সমস্ত জৈব-রাসায়নিক (Biochemical) কাজ প্রোটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়। প্রোটোপ্লাজমকে প্রধানত দুই অংশে ভাগ করা যায়। সেগুলো হচ্ছে ১। নিউক্লিয়াস এবং ২। সাইটোপ্লাজম।

তোমরা যারা 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে রূপকথা পড়েছ, সেখানে নিশ্চয়ই দেখে থাকবে, গল্পের দৈত্যটিকে বধ করা খুব কঠিন। কারণ, তার প্রাণ লুকানো থাকে গভীর এক তালপুকুরের মাঝখানে ছোট্ট একটি কৌটার মধ্যে রাখা এক ভোমরার ভেতরে। গল্পের তালপুকুর আর তার মাঝখানের কৌটার কথাটা মনে রেখে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াসের পরিচয়টা খুব সহজেই বুঝে নেওয়া যায়।

আমরা যদি কোষের প্রোটোপ্লাজমকে গল্পের তালপুকুর মনে করি, তবে পুকুরের মাঝখানের কৌটাটা হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াস, আর পুকুরের পানি হচ্ছে কোষের সাইটোপ্লাজম। শুধু তাই নয় নিউক্লিয়াসের ভেতরে যে ক্রোমোজম থাকে, সেটাকে তুলনা করা যায় প্রাণভোমরার সঙ্গে। লক্ষ করে দেখো, কৌটাটা পুকুরের ভেতর থাকলেও তার কিন্তু নিজস্ব সীমা আছে, আবরণ আছে। কোষের নিউক্লিয়াসের বেলায়ও তাই। সেটিরও নিজস্ব আবরণ আছে যা সেটিকে সাইটোপ্লাজম থেকে আলাদা করে রাখে। এবার আমরা রূপকথার বাইরে গিয়ে আরো একটু বিস্তারিতভাবে এই গঠন বৈশিষ্ট্য জানব।

১। নিউক্লিয়াস (Nucleus): বিভিন্ন কোষের প্রোটোপ্লাজম-এ অবস্থিত দ্বি-স্তরবিশিষ্ট ঝিল্লি দিয়ে ঘিরে রাখা ঘন, অস্বচ্ছ অঙ্গাণুটি হলো নিউক্লিয়াস। সকল জীবের কোষে নিউক্লিয়াস থাকে না। যেসব কোষের নিউক্লিয়াস সুগঠিত অর্থাৎ নিউক্লিয়ার ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুসংগঠিত থাকে, তাকে প্রকৃত কোষ (Eukaryotic cell) বলে। প্রকৃত কোষ দুই প্রকার, যথা: দেহকোষ এবং জনন কোষ। অপরদিকে যেসব কোষে নিউক্লিয়াস সুগঠিত থাকে না, সেগুলোকে আদি কোষ (Prokaryotic cell) বলে। যেমন, ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে এক ধরনের আদিকোষ।

রবার্ট ব্রাউন (Robert Brown) (১৮৩১) অর্কিডের পাতার কোষে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার এবং নামকরণ করেন। প্রতিটি কোষে সাধারণত একটি নিউক্লিয়াস থাকে। তবে কোনো কোনো শৈবাল এবং ছত্রাকের একেকটি কোষে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াস প্রধানত কোষের কেন্দ্রস্থলে থাকে এবং বিভিন্ন কোষভেদে নিউক্লিয়াস সাধারণত গোলাকার, উপবৃত্তাকার বা নলাকার হয়ে থাকে।

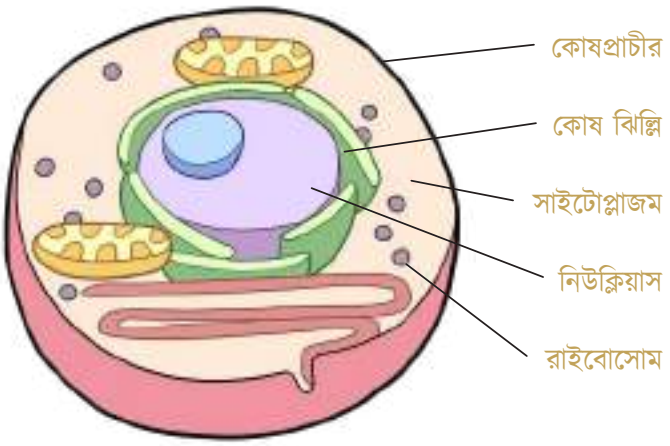

কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের সুরক্ষিত অবস্থান। নিউক্লিয়াসের নিজস্ব পর্দা আছে যা তাকে সাইটোপ্লাজমের অন্যান্য অংশ থেকে পৃথক রাখে।

নিউক্লিয়াস কোষের সব ধরনের কার্য-কলাপের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। নিউক্লিয়াসের ভেতরে ক্রোমোজম (Chromosome) নামে একটি বিশেষ বস্তু অবস্থান করে (অনেকটা উপরের গল্পের প্রাণভোমরার মতো), যা জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্রোমোজমে আসলে জীবের বংশগতি পদার্থ ডিএনএ (DNA: Deoxyribonucleic acid বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিয়িক অ্যাসিড)-এ ধারণ করে। ডিএনএ তথা ক্রোমোজমের যদি কোনো ক্ষতি হয়, তবে তা জীবের জন্যও ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। তাই ডিএনএ কে সুরক্ষা দেবার জন্যই নিউক্লিয়াসের ভেতর তার অবস্থান। ডিএনএর গঠন ও কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে মাতা-পিতার জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

২। সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm): কোষের নিউক্লিয়াসের বাইরে অবস্থিত এবং কোষ ঝিল্লি দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের বাকি অংশের নাম সাইটোপ্লাজম। এটি প্রধানত প্রোটিন দ্বারা গঠিত। সাইটোপ্লাজম কিন্তু কোনো ফাঁকা স্থান নয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে এই সাইটোপ্লাজমে বেশ কয়েক রকমের অঙ্গাণু দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম (Ribosome), গলজি বডি (Golgi body), আন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা (Endoplasmic reticulum), কোষ গহবর (Vacuole), লাইসোসোম (Lysosome) ইত্যাদি। এছাড়া উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিড (Plastid) এবং প্রাণী কোষে সেন্ট্রোসোম (Centrosome) ও সেন্ট্রিয়োল (Centrioles) থাকে।

সাইটোপ্লাজম কোষের এসব অঙ্গাণু ধারণ করে। এছাড়া কোষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া, যেমন- শক্তি উৎপাদন, জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ, পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীলতা

ইত্যাদি সম্পন্ন হয় সাইটোপ্লাজমে। যে কোনো জীবের দেহে সংঘটিত সকল রাসায়নিক বিক্রিয়াকে একত্রে বিপাক (Metabolism) বলে। বিপাক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কোষে নির্দিষ্ট মাত্রার অম্লত্ব বা ক্ষারীয় অবস্থা বজায় রাখতে হয়। সাইটোপ্লাজম কোষের অম্লীয় বা ক্ষারীয় অবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করে।

আগেই বলা হয়েছে, সাইটোপ্লাজমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু অবস্থান করে। তবে এই শ্রেণিতে আমরা সেগুলোর সবার পরিচয় বিস্তারিত জানব না। কেবল দুটো অঙ্গাণু- মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। বাকি অঙ্গাণুগুলো নিয়ে আমরা উপরের শ্রেণিতে জানব।

আমরা অনেক সময় গাছের যে অনুভূতি আছে বা গাছ যে সংবেদনশীল তা প্রমাণে লজ্জাবতীর পাতা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করি। এর কারণ কি জানো? এর পেছনে কোষ গহ্বর (Vacoule) এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। লজ্জাবতী পাতার গোড়ায় অনেক কোষ থাকে। ওই সব কোষের কোষ গহ্বর পানি ভর্তি থাকে। পানিভর্তি হওয়ার কারণে লজ্জাবতী গাছের পাতার ডাঁটা সোজা হয়। কিন্তু হঠাৎ পাতা ছুঁলে কোষ থেকে পানি বেরিয়ে যায়। ফলে ফোলা কোষগুলো চুপসে যায় এবং লজ্জাবতী পাতার ডাঁটা নিচের দিকে নুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে সব পাতার কোষে এই প্রভাব পড়ে এবং এভাবে সব পাতা নুয়ে যায়।

মাইটোকন্ড্রিয়া (Mitochondria):

এটি কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু যেখানে শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের কয়েকটি ধাপ সম্পন্ন হয়। শ্বসন প্রক্রিয়ায় কোষের ভেতর থাকা গ্লুকোজ অণু ভেঙে জীবের ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপন্ন হয়। এ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তোমরা এই বইয়ের জৈব শক্তি অধ্যায়ে আরো বেশি জানতে পারবে। মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি উৎপাদনে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে একে কোষের শক্তিঘর (Powerhouse) বলা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণী- উভয় কোষেই মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে।

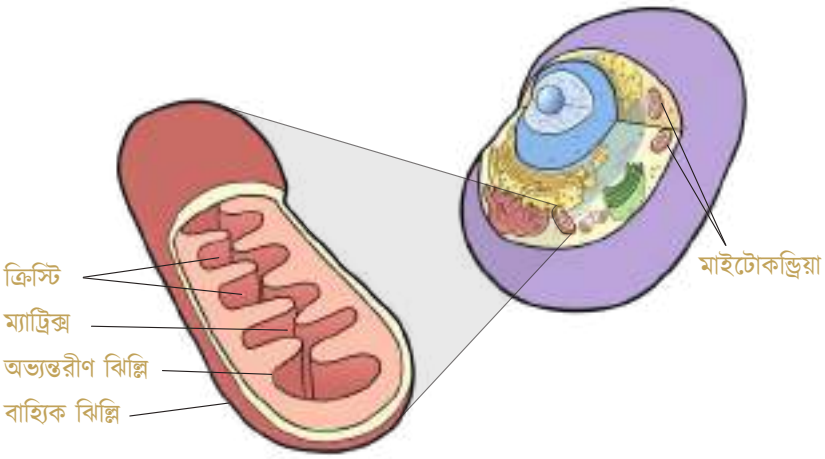

কোষের ভেতর একটি মাইটোকন্ড্রিয়া। এতে ম্যাট্রিক্স, ঝিল্লি ইত্যাদির অবস্থান দেখানো হয়েছে।

প্রতিটি মাইটোকন্ড্রিয়া দুই স্তরবিশিষ্ট আবরণ বা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে। এই ঝিল্লিটি প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে তৈরি। মাইটোকন্ড্রিয়ার ঝিল্লির বাইরের আবরণটি মসৃণ, কিন্তু ভেতরের আবরণটি স্থানে স্থানে ভাঁজ হয়ে ভেতরের দিকে ঝুলে থাকে। এ ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টি (Cristae) বলা হয়। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভেতরের অর্ধতরল দানাদার পদার্থকে ম্যাট্রিক্স (Matrix) বলা হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার নিজস্ব ডিএনএ আছে, যা সেগুলোর ম্যাট্রিক্স-এ অবস্থান করে। একটি কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা কয়েকশ থেকে কয়েক হাজার পর্যন্ত হতে পারে। কার্ল বেন্ডা (Carl Benda) ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মাইটোকন্ড্রিয়া নামকরণ করেন।

প্লাস্টিড (Plastid): প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ক্ষুদ্র, দানাদার বিভিন্ন আকারের প্লাস্টিড পাওয়া যায়। এর উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফলে বিচিত্র রং দেখা যায়। উদ্ভিদ কোষে সাধারণত তিন প্রকার প্লাস্টিড থাকে। যথা- ক্রোমোপ্লাস্ট, ক্লোরোপ্লাস্ট এবং লিউকোপ্লাস্ট। সবুজ ছাড়া অন্যান্য বর্ণ যেমন লাল, হলুদ ইত্যাদি বর্ণ বহনকারী প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট (Chromoplast) বলা হয়। ফুলের পাপড়িতে ও ফলে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। এজন্য ফুল ও ফল বিভিন্ন বর্ণের দেখা যায় ক্রোমোপ্লাস্টের উপস্থিতির কারণে। উদ্ভিদে বর্ণহীন যেসব প্লাস্টিড থাকে, সেগুলোকে বলা হয় লিউকোপ্লাস্ট (Leucoplast)। উদ্ভিদের মাটির নিচের অংশ, ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ড, মূল প্রভৃতিতে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। এরা খাদ্য সঞ্চয় করে।

বিভিন্ন রকমের প্লাস্টিড

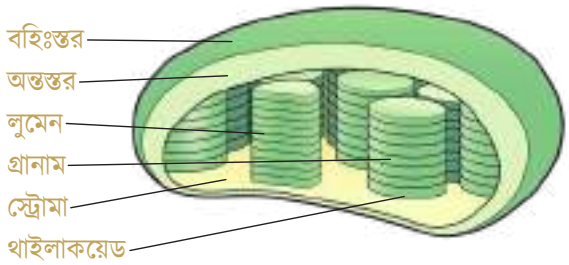

ক্লোরোপ্লাস্টের বিস্তারিত গঠন

উদ্ভিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লাস্টিড হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট। ক্লোরোপ্লাস্টে সবুজ বর্ণের ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামের অণু থাকে বলে। ক্লোরোপ্লাস্টের উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের পাতা ও কচি শাখা প্রশাখা সবুজ দেখায়। মানুষসহ জীবজগতের বেশির ভাগ সদস্য সেগুলোর শক্তির জোগান পায় যে প্রক্রিয়া থেকে, সেই সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় ক্লোরোপ্লাস্টে। এজন্য কোষের সকল অঙ্গাণু মধ্যে ক্লোরোপ্লাস্ট একটি বিশেষ অবস্থান অধিকার করে আছে। কেবল উদ্ভিদ কোষেই ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে, প্রাণীকোষে থাকে না।

কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার মতো ক্লোরোপ্লাস্টেরও নিজস্ব ডিএনএ আছে। সুতরাং যদি প্রশ্ন হয়, নিউক্লিয়াসের বাইরে কোষের আর কোন কোন অঙ্গাণুতে ডিএনএ থাকে, তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের নাম আসবে। বিজ্ঞানীরা ফসলের ফলন বৃদ্ধি, রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য নিউক্লিয়াসের পাশাপাশি মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের ডিএনএ নিয়েও অনেক গবেষণা করছেন এখন।

কোষের বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধি

জীবের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য তার কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি দরকার। কোষ সংখ্যায় বাড়ে বিভাজনের মাধ্যমে। অর্থাৎ একটি কোষ বিভাজিত হয়ে দুটি হয়, দুটি থেকে চারটি হয় ইত্যাদি। জীবের দেহ গঠনের জন্য দরকার দেহকোষ (Somatic cell)। অপরদিকে তার প্রজননের জন্য দরকার হয় প্রজনন কোষ (Reproductive cell)। উচ্চশ্রেণির জীবে, যেমন মানুষের ক্ষেত্রে দেহকোষ বিভাজিত হয় যে প্রক্রিয়ায়, তাকে বলা হয় মাইটোসিস (Mitosis) কোষ বিভাজন। অপরদিকে প্রজনন কোষ তৈরি হবার প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় মায়োসিস (Meiosis) কোষ বিভাজন।

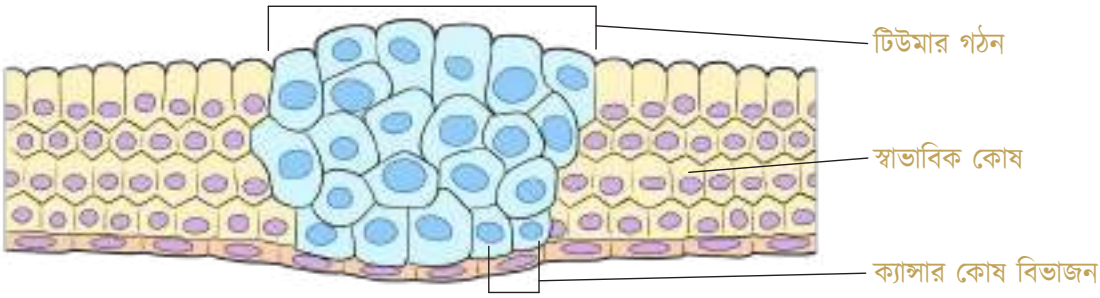

কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের পরিণতি

কোষ বিভাজন অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত একটি প্রক্রিয়া। যেকোনো জীব চায় তার কোষের সংখ্যা যেন অনিয়ন্ত্রিতভাবে না বাড়ে। শুধু সংখ্যার দিক থেকেই নয়, গুণগত দিক থেকেও কোষগুলো স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের হওয়া জরুরি। যদি কোনো কোষ অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংখ্যায় বাড়তে থাকে, তবে তা জীবের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। এরকম ক্ষতিকর পরিণতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হচ্ছে ক্যান্সার। মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষ বিভাজন হয়। সংখ্যাবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়ায় একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোষগুলোর মৃত্যু হয়। এভাবে জীবের কোষের সংখ্যার একটি ভারসাম্য রক্ষা হয়। কিন্তু যদি কোনো কারণে কোষের মৃত্যু না হয়, অথচ নতুন নতুন কোষ তৈরি হতেই থাকে, তবে শরীরে টিউমার হতে পারে, যা এক পর্যায়ে ক্যান্সারের রূপ গ্রহণ করে।

আমরা মায়োসিস প্রক্রিয়ায় জনন কোষ তৈরি হবার বিষয়টি উপরে জেনেছি। জননকোষে নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকা দরকার। যদি কোনো কোষে স্বাভাবিকতার চেয়ে বেশি বা কম ক্রোমোসম থাকে, তবে এসব জনন কোষ থেকে অস্বাভাবিক বৈশিস্ট্যসম্পন্ন সন্তান জন্ম নেবে। উপসর্গগুলোর মধ্যে কিছু রয়েছে যেমন ভাষা প্রকাশে অসুবিধা, বসা এবং হাঁটার সমস্যা এবং আচরণগত-আবেগজনিত সমস্যা। আশপাশে যাদের এরকম সমস্যা আছে তুমি ও তোমার বন্ধুরা তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করে তোমাদের এলাকায় একটি পরিবর্তন আনতে পারো।

এই আলোচনা থেকে বলা যায় যে, জীবের স্বাভাবিক প্রজনন ও বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিক কোষ বিভাজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুশীলনী ?

১। একটা উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের মাঝে কোন পার্থক্যটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ মনে হয়? কেন?

২। আমাদের শরীরে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোষের মৃত্যু হয়। সময় মতো মৃত্যু না হলে আমাদের কী সমস্যা হতে পারে? এই ছন্দপতন কেন হয় এবং তা ঠেকানোর জন্য আমাদের কী করণীয় ?